# পুনর্বিবাহ সেভাবে চালু হলো না দুশো বছরেও: বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ

শাশ্বতী ঘোষ

উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু ২০১৮ সালে জুন মাসে বিধবা কল্যাণে নিয়োজিত একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন 'বিপত্নীকরা পুনর্বিবাহ করলে বিধবারা করতে পারেন না কেন?' খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। তবে দুঃখের বিষয় তিনি বিষয়টি  সমাজের মনের কাঠামো বদলের উপরে ছেড়ে দেন, সরকার, প্রশাসন এগিয়ে এসে কী করতে পারে তা নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখেন না বা রাখতে সংশ্লিষ্ট কোনো দপ্তরকে নির্দেশ দেন না। তার থেকে অনেক বেশি সক্রিয় সর্বোচ্চ আদালত। এর ঠিক এক বছর আগে, ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয় বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য স্পষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করুক। যথারীতি বৃন্দাবনের বিধবাদের দুরবস্থা নিয়ে আগে পরেও বহু আবেদন আদালতে এসেছে, এটিও সেইরকম একটি আবেদন ছিল। তাতে সর্বোচ্চ আদালত বলে আগের পরিকল্পনাগুলিও কেন রূপায়িত হয়নি? হয়তো প্রশ্নই সার। বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুর্দশা দেখে পুনর্বিবাহ আইনি করার পথে হেঁটেছিলেন। আজ, তাঁর জন্মের দু'শো বছর পরে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে এই মুহূর্তে এদেশে বিধবারা কেমন আছেন? কতজনের পুনর্বিবাহ হচ্ছে, তার তথ্য অবশ্য পাওয়া এখনো বেশ কঠিন।

বিধবারা নিজেরা এবং তাঁর চারপাশের সমাজ যদি মেনে নেন যে প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুযায়ী, স্বামীর বয়স স্ত্রীর থেকে বেশি হবে বলে, এবং প্রাকৃতিক সুরক্ষার জন্য মেয়েদের বাঁচার সম্ভাবনা তো বেশি ছিলই, এখন উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-পুষ্টি-চিকিৎসার সুযোগ বাড়লে বয়স্কদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই

বিধবার সংখ্যা বাড়বে, তাহলে বৈধব্যকে জীবনচক্রেরই একটি অংশ বলে মেনে নেওয়া যায়। এখনও তো পরিবার-পরিজন থেকে সমাজ—বৈধব্যের জন্য সেই মেয়েটিকেই দায়ী করে। এবং এই আঙুল-তোলার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় সেই মেয়েটির শোকের পাশে সহমর্মী হয়ে না দাঁড়িয়ে, তাকেও মৃতবৎ বানিয়ে তোলার প্রক্রিয়া। সেই মেয়ে সাদা কাপড় পরবে, কোনো প্রসাধন ব্যবহার করবে না, অলঙ্কার তো নয়ই, দিনে একবার খাবে, নিরামিষ খাবে যাতে তার শরীর 'ঠান্ডা' থাকে। এককথায়, তার নিরাপত্তার জন্যই তার শরীর, তার কামনা-বাসনা সবকিছুকে নিঃশেষ করে দিতে হবে, যাতে তার দিকে কোনো পুরুষ কামগন্ধী চোখ নিয়ে তাকাতে না পারে। আর সে তো মৃতবৎ, তাই তার অলঙ্কার থেকে সম্পত্তি, সবকিছুর অধিকার থেকেই তাকে বহুসময়ে বঞ্চিত করে তার স্বামীর পরিবারের লোকজন, এমনকি 'অপয়া', 'ভাতারখাকী' অপবাদ দিয়ে তাড়িয়েও দেয়। হয়তো এই তাড়ানোর মধ্যে বহুসময়ে সম্পত্তি দখলের মতলব কাজ করে, কিন্তু মেয়েরাও নিজেদের কপালকে দোষ দিয়ে সেই অপবাদকে সত্য বলেই মেনে নেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যান, যেন তাঁর দোষেই তাঁর স্বামীটি চলে গেছেন।

### বিধবারা: এখন

২০১১ সালের জনগণনা বলছে আমাদের দেশের ১২১ কোটি জনগণের মধ্যে ৫.৬ কোটি হচ্ছেন বিধবা, মেয়েদের মধ্যে প্রায় ৮ শতাংশ। ২০০১ সালে বিধবার সংখ্যা ছিল ৩.৪ কোটি, মেয়েদের অনুপাতে ৬.৪ শতাংশ, ১৯৯১ সালের জনগণনায় বিধবা ছিলেন ৩.৩ কোটি, মেয়েদের মধ্যে ৮ শতাংশ। ২০২১ সালের জনগণনা যথাসময়ে সমাপ্ত হলে আগামী বছরে এই সময়ে বিধবাদের সংখ্যা হয়তো জানা যাবে। বয়স হিসাবে দেখলে ১০-১৯ বছরের বিধবা, অর্থাৎ নাবালিকা বিধবা শতাংশের অনুপাতে হয়তো কম, ০.৫ শতাংশ, কিন্তু আমাদের দেশের জনসংখ্যা হিসাবে সংখ্যাটা কিন্তু মোটেই কম নয়, ১.৯৪ লক্ষ। শিশুবিবাহ বন্ধের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছে শিশুবিবাহ, প্রায় দু'লক্ষ বালবিধবা তার ভার বহন করছে। এই দু'লক্ষ বালবিধবা, যাদের অনেকেই কুমারী, কারণ হয়তো তার বিয়ের পর শ্বশুরঘরে যাওয়াই হয়নি, কিন্তু সমাজের চোখে সেই শিশু বা কিশোরীটি বিধবাই। তার সামাজিক অবস্থানটা সবচেয়ে অদ্ভুত। সে যেহেতু বিধবা, বিয়ে হয়ে গেছে, অতএব সে সমাজের চোখে বয়ঃপ্রাপ্ত। এদের জন্য আজ আর এক বিদ্যাসাগর প্রয়োজন।

অন্যদিকে যদি ক্রমশঃ বেশি বয়সের দিকে যাওয়া যায়, বিপত্নীকের তুলনায় বিধবার সংখ্যা বাড়ে। ৭০-এর বেশি বয়সিদের কথা ধরলে তাঁদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ বিধবা। তার কারণ আমাদের দেশে এখন পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের প্রত্যাশিত আয়ু বেশি—পুরুষদের যেখানে ৬৫ বছর, মেয়েদের সেখানে ৬৮ বছর। আরেকটা কারণ হলো সব বয়সেই মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের পুনর্বিবাহের সম্ভাবনা বেশি। তবে বেশি বয়সে, পুত্রসন্তান-পরিবার সবকিছুর কর্ত্রী হিসাবে বিধবা হলে আমাদের সমাজে সেই মহিলারা একধরণের স্বাধীনতাও অনুভব করেন। তাঁরা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আর বাঁধা নন, এখন তাঁরা চাইলে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন, চেনাজানার বাড়ি যেতে পারেন, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি খোঁজ নিতে যেতে পারেন, রাস্তায় গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারেন, মন্দিরের বা প্ল্যাটফর্মের ঠান্ডা চাতালে গিয়ে বসতে পারেন, এমনকি তীর্থেও যেতে পারেন।

## বিধবারা: উত্তর-দক্ষিণ

মজার বিষয় হলো রাজ্যওয়ারি বিধবার সংখ্যা হোক বা অনুপাত, যাই ধরা হোক না কেন, উত্তর আর দক্ষিণ ভারতে বিধবাদের সংখ্যার বিস্তর ফারাক। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে বিধবাদের উপস্থিতি অনেক বেশি সংখ্যায়। পণ্ডিচেরি, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে বিধবাদের অনুপাত সারা ভারতে সবচেয়ে বেশি। উত্তরপ্রদেশেও বিধবারা সংখ্যায় বেশ বেশি, কারণ জনসংখ্যাও সেখানে বেশি, কিন্তু অনুপাত হিসাবে কম, যেমন কম বিহারেও। মনে করা হচ্ছে দক্ষিণের রাজ্যগুলি মেয়েদের প্রতি অনেক সদয়, অন্য ভাষায় লিখলে দক্ষিণের রাজ্যে লিঙ্গসাম্য উত্তরের রাজ্যগুলির তুলনায় বেশি, তাই মেয়েদের বাঁচার সম্ভাবনাও বেশি। এর সঙ্গে সঙ্গে কম সন্তানের সংখ্যা মায়েদের শরীরে চাপ ফেলে কম, চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো বলে মেয়েদের মৃত্যুহার কম, বিয়ে হয় কাছেপিঠে, ফলে বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় থাকে বলে আপদেবিপদে পাশে পাওয়া যায়। এই সব মিলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে মেয়েরা বাঁচেন অনেক বেশি দিন। তাই বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার সংখ্যাও সেসমস্ত রাজ্যে বেশি। অন্যদিকে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে যেখানে মানব উন্নয়ন সূচকের মান বেশ খারাপ কারণ স্বাস্থ্য-শিক্ষা সবকিছুতেই মেয়েদের প্রতি বৈষম্য এতই বেশি যে মেয়েদের স্বাস্থ্য সহজেই ভেঙে পড়ে, বেশিরভাগ সময়ে স্বামীর আগেই

তাঁরা মারা যান, বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ হয় খুব কম মেয়ের। যদিও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলে যে সমান খাদ্য-পুষ্টি-চিকিৎসা পেলে মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি বাঁচবেন। তাই পিছিয়ে-পড়া রাজ্যে বিধবার সংখ্যা কম হবে, কারণ মেয়েরা বাঁচার সমান সুযোগই পাননা।

বিদ্যাসাগরের জন্মের দু'শো বছর পরেও হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ খুব কম হয়। তাঁদের প্রতি বৈষম্যের মনোভাব যে খুব কমেছে তাও নয়। এখনো অসহায় বিধবাদের ছেড়ে আসা হয় কাশী-বৃন্দাবন-মথুরায়, যেখানে নামগান, ভিক্ষা নয়তো বারবনিতাবৃত্তি করেই মানবেতর জীবন কাটে তাঁদের। এরকম প্রায় লক্ষাধিক বিধবার খবর ছিল যাঁদের এই বঙ্গভূমি থেকে অসহনীয় অবমাননার এক জীবনে আত্মীয়স্বজনরা পরিত্যাগ করে এসেছেন। যাঁরা পরিবারে থেকে গেলেন, কোনোক্রমে পরিশ্রম করে ভরণপোষণের বিনিময়ে সেই আশ্রয়কে টিঁকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। আর যদি তিনি পুত্রসন্তানের জননী হন, তাহলে তবু রক্ষা, আর সন্তানহীনা বা শুধু কন্যাসন্তানের জননী হলে তো তাঁকে তাঁর স্বামীর পরিবার আরোই বোঝা মনে করবে।

বিধবার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে যেহেতু স্বামী বা পিতৃকুল কেউই সাধারণত চায় না, তাই বিশেষত গ্রামের দিকে মেয়েদের কাজে অংশগ্রহণের হারে বিয়েটা টিঁকে নেই বা বিয়েটা হয়ে ওঠেনি এরকম মেয়ের অনুপাত সবচেয়ে বেশি। বিয়ে-টিঁকে-নেই বলতে—হতে পারে বিবাহবিচ্ছিন্না, স্বামীপরিত্যক্তা অথবা বিধবা। এঁদের মধ্যে বিধবারাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। ২০০৪-৫ থেকে ২০১১-১২ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এঁদের অর্থকরী কাজে অংশগ্রহণ, বলছে ইন্ডিয়া হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট। ২০১৫-১৬ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষাও সেই তথ্য সমর্থন করছে। এদেশের বিধবাদের নিয়ে গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ মার্থা অল্টার চেন বলছেন বিধবা হওয়ার পরেই মেয়েদের মধ্যে কৃষি বা অকৃষি উভয় ক্ষেত্রেই স্বনিযুক্তি কমছে (২৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ), বাড়ছে মজুরি শ্রম (৩২ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশ, *লিসেনিং টু উইডোস ইন রুরাল ইন্ডিয়া: উইমেন: এ কালচারাল রিভিউ*, ১৯ জুন, ২০০৮)। আর কাজে অংশগ্রহণের হার সবচেয়ে তলানিতে হলো বিবাহিতা মেয়েদের, কারণ তাঁদের ভরণপোষণের জন্য স্বামীরা আছেন বলে স্ত্রীরা কাজে যোগ দেওয়া, বা চলতি মজুরিতে কাজে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন

না বা পরিবার থেকে কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি পাচ্ছেন না। আর পরিবারে বিধবারা যদি কর্ত্রী হন, অর্থাৎ স্বামী গত হয়েছেন, তাহলে চোখ বুজে বলে দেওয়া যেতে পারে সেই পরিবারটি হবে দরিদ্র। জঁ দ্রেজ আর শ্রীনিবাসন দেখিয়েছেন এই পরিবারগুলোতে দারিদ্র্য হবে জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি আর ভোগের পরিমাণ হবে জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। আর যদি সেই বিধবার পরিবারে

## রাজ্যভিত্তিক বিধবা/বিপত্নীক, ২০০১ (শতকরা)

| রাজ্য | পুরুষ (বিপত্নীক) | | | | | নারী (বিধবা) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৬১ | ১৯৭১ | ১৯৮১ | ১৯৯১ | ২০০১ | ১৯৬১ | ১৯৭১ | ১৯৮১ | ১৯৯১ | ২০০১ |
| ভারত | ৩.৬৯ | ২.৯৪ | ২.৪৩ | ১.৯৩ | ১.৮ | ১০.৮২ | ৮.৮৬ | ৮.০৬ | ০.৬৫ | ৬.৯ |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | ৩.৪১ | ২.৭ | ২.১৭ | ১.৫৫ | ১.৫ | ১৩.৬৪ | ২২.৬৬ | ১০.২২ | ৮.৩৮ | ৮.৭ |
| বিহার | ৩.৯৪ | ৩.২২ | ২.৬৬ | ২.০৩ | ২.০ | ১০.৯১ | ৮.৬৫ | ৭.৩০ | ৪.৮৩ | ৪.৭ |
| গুজরাট | ৩.১১ | ২.৩৪ | ২.০০ | ১.৭২ | ১.৯ | ৯.২৭ | ৭.৭১ | ৬.৯৯ | ৫.৯৫ | ৬.৬ |
| হরিয়ানা | ** | ৩.২৪ | ২.৬২ | ১.৯০ | ১.৯ | ** | ৫.৩৩ | ৫.০০ | ৪.৩৭ | ৫.৫ |
| কর্ণাটক | ৩.১৬ | ২.২৭ | ১.৮২ | ১.৪৩ | ১.৩ | ১২.৩৬ | ১০.৩৫ | ৯.৫৯ | ৮.২৭ | ৯.০ |
| কেরালা | ১.৭১ | ১.১৯ | ১.১৬ | ০.৯৬ | ১.২ | ১০.০৪ | ৮.৯৯ | ৯.১৩ | ৮.৭৬ | ১০.৩ |
| মধ্যপ্রদেশ | ৩.৯২ | ৩.২১ | ২.৬৮ | ২.২৩ | ২.১ | ১১.০১ | ৮.৮১ | ৭.৭৬ | ৬.২০ | ৬.১ |
| মহারাষ্ট্র | ৩.১৩ | ২.১৪ | ১.৭৭ | ১.৪৩ | ১.৪ | ১১.৪৯ | ৯.৩০ | ৮.৭৩ | ৭.৪১ | ৮.০ |
| উড়িষ্যা | ২.৮৬ | ২.২৯ | ২.৩০ | ২.০৫ | ১.৮ | ১২.০৩ | ৯.০৫ | ৯.০১ | ৭.৩৬ | ৭.৬ |
| পাঞ্জাব | ৪.৬৭ | ৩.৩১ | ২.৮২ | ২.১৬ | ২.১ | ৭.১৬ | ৫.৫৪ | ৫.৪২ | ৪.৬২ | ৫.৮ |
| রাজস্থান | ৩.৯৮ | ৩.১১ | ২.৫৬ | ২.১০ | ১.৯ | ৯.৫২ | ৭.৮০ | ৭.১২ | ৫.৭৯ | ৫.৯ |
| তামিলনাড়ু | ৩.১৫ | ২.৫৬ | ২.৩০ | ২.০৪ | ২.০ | ১২.৭৮ | ১০.৯৪ | ১০.১১ | ৮.৭৭ | ৯.৬ |
| উত্তরপ্রদেশ | ৫.৪২ | ৪.৬৯ | ৩.৭৮ | ৩.০০ | ২.৬ | ৯.৫৪ | ৭.৫৮ | ৬.৪৩ | ৪.৫৬ | ৪.৮ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ২.৬৭ | ২.১৭ | ১.৪২ | ১.১৮ | ১.১ | ১২.৩৬ | ৯.৮০ | ৯.২০ | ৭.৮১ | ৮.২ |

অবিবাহিত সন্তানরা থাকে, এবং সবচেয়ে বড়ো পুত্রটি যদি নিতান্ত ছোটো হয়, সেই পরিবার হবে আরোই দরিদ্র (জঁ দ্রেজ ও পি ভি শ্রীনিবাসন, উইডোহুড *অ্যান্ড পভার্টি ইন রুরাল ইন্ডিয়া: ইনফারেন্সেস ফ্রম হাউজহোল্ড সার্ভে ডেটা*, মার্থা অল্টার চেন সম্পাদিত *উইডোস ইন ইন্ডিয়া: সোশ্যাল নেগলেক্ট এন্ড পাবলিক অ্যাক্শন*, সেজ, নয়া দিল্লি, ২০০৯)।

## বিদ্যাসাগর: পুনর্বিবাহ উদ্যোগ

শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে বুনে লিখেছিলেন 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে'। পড়শি কিশোরীর অকালবৈধব্যে কাতর হয়ে মা ভগবতী দেবী পুত্রকে বলেন কোনো পথ দেখতে।

বাবা ঠাকুরদাস আর মায়ের সম্মতি আর আশীর্বাদ নিয়ে বিদ্যাসাগর শুরু করলেন বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রের সমর্থন অনুসন্ধান, জানতেন সমাজের প্রবল বিরোধিতা তাঁকে সইতে হবে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন শুধু খাওয়ার সময়টুকু বাদে ঈশ্বরচন্দ্র পড়ে থাকতেন সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে, শাস্ত্রের সমর্থন চাই। অবশেষে ১৮৫৩ সালে পেলেন পরাশর সংহিতায় দুটি পঙ্‌ক্তি: 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে, ক্লীবে চ পতিতে পতৌ', অর্থাৎ স্বামী নিখোঁজ হলে বা তাঁর মৃত্যু হলে, নপুংসক বা পতিত হলে তাঁর স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পারবেন। এই মতের সমর্থনে অন্য শাস্ত্রবিদদের পেলেন। ১৮৫৫ সালে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব' দু'হাজার কপি ছাপলেন। মুহূর্তে নিঃশেষ। আরো তিনহাজার কপি। ভারত জুড়ে বিতর্কের ঝড়। আরো দশ হাজার কপি ছাপা হলো। ১৮৫৫ সালের অক্টোবরে ৯৮৬ জনের সই নিয়ে সরকারের কাছে দরবার। প্রত্যাশিতভাবেই বিরোধিতা, সরকারের কাছে আরো আরো অনেক সই নিয়ে ধর্মে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি। তবুও ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনসম্মত হলো।

সমাজে প্রচুর আলোড়ন উঠেছিল প্রত্যাশিতভাবেই, কিন্তু বাস্তবে কতজন বিধবা পুনর্বিবাহে প্রস্তুত ছিলেন, বিশেষত তথাকথিত কুলীন পরিবারগুলিতে, কতজন প্রতারিত বা পরিত্যক্ত হয়েছেন, কতগুলি নারীহত্যা বা ভ্রূণহত্যা ঘটেছে আর কতজনই বা সমাজভয়ে ইচ্ছে থাকলেও পিছিয়ে গেছেন, তার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। মেলে বিভিন্ন সংবাদপত্রের টুকরো খবর, তাও বেশ কেচ্ছা পরিবেশনের ঢঙেই। তবে পথ আটকে সবচেয়ে বেশি ছিল সমাজভয়। তা এতটাই যে প্রথম বিধবাবিবাহের পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে বালবিধবা কালিমতীকে বিয়ের পর স্ত্রী মারা গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে 'উঠতে' হয়েছিল।

## বিধবার পুনর্বিবাহ: তখন

১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন চালু হচ্ছে, প্রথম বিধবাবিবাহটি হচ্ছে ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬ তারিখে। কিন্তু তখনও বিধবাবিবাহ খুব বেশি সংখ্যায় হয়নি। পরের কুড়ি বছরে ৮০টি, ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত সাকুল্যে ৫০০টি। কেন এই ব্যর্থতা? চলতি ব্যাখ্যা হলো যে—সমাজভয়, বিয়ের বাজারে বিধবাদের খুব চাহিদা ছিল না। অন্য একটি ব্যাখ্যা বলছে যে বিধবাবিবাহ আইনে গুরুতর সীমাবদ্ধতা ছিল যাতে সুযোগসন্ধানী পাত্ররা বিধবাকে বিয়ে করে আবার পরিত্যাগ

করে যেতে পারে এই অবকাশ ছিল কারণ বহুবিবাহ তখনও বেআইনি হয়নি, তাই বহু বিধবার অভিভাবক বিধবার বিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন না।

অন্যদিকে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকা যুক্তি দিচ্ছে যে কুমারী বিয়ে করলে প্রচুর পণ পাওয়া যাবে, বিপরীতে বিধবাবিবাহের ফলে সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যে মূল্য দিতে হবে এবং বিধবাটি তার স্বামীর দিকের সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে বলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে,—সেটির ক্ষতিপূরণ পাত্রটি পাবে কোথায় যদি না বিধবার নিজস্ব সম্পত্তি থাকে অথবা তার অভিভাবকরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ দিতে প্রস্তুত থাকেন। সংবাদপত্রের মতে যেহেতু কুমারীবিবাহে আর্থিক লাভ বেশি, পাত্রী সহজেই মেলে আর সামাজিক ঝামেলার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই পাত্ররা সেদিকেই ঝুঁকেছিল। কিন্তু এই সময়ে বিধবাবিবাহে প্রাপ্তিও খুব কম ছিল না। বিদ্যাসাগর নিজে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে ৬০টি বিধবাবিবাহে ১৫০০ টাকা করে খরচ করেছিলেন (মোট ৮৫,০০০ টাকা)। বর্ধমানের মহারাজাও বিধবাবিবাহ করলে নগদ পুরস্কার আর চাকরির ঘোষণা করেন। তাহলে? গবেষক ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত ও দিগন্ত মুখার্জি (*এ রিভিসনিস্ট অ্যানালিসিস অফ দ্য ফেলিওর অফ দ্য উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট অফ ১৮৫৬, কনটেম্পোরারি ইস্যুস অ্যান্ড আইডিয়াস ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস*, এপ্রিল ২০০৭) ১৮৮১ সালের জনগণনা বিশ্লেষণ করে বলছেন গড়পড়তা হিন্দু পুরুষ ৪০ বছরের চেয়ে খুব বেশি একটা বাঁচতেন না। তাহলে তো তাঁদের ৩০ বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলা উচিত, না হলে বংশরক্ষা হবে না, পিতৃপুরুষরা জল পাবেন না। অথচ জনগণনা দেখাচ্ছে ১৫-১৯ বছর বয়ঃসীমার ৭০ শতাংশ পুরুষ অবিবাহিত। এনারা দেখালেন ২০-২৪ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে ৪০ শতাংশ পুরুষ ছিলেন অবিবাহিত, ২৫-২৯ বয়ঃসীমার মধ্যে ২০ শতাংশ , এমনকি ৩০-৩৯ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে ৮ শতাংশ ছিলেন অবিবাহিত। বিশেষত লিঙ্গানুপাতের হিসেব দেখলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলের সংখ্যা বেশি। এঁদের কেউ কি পাত্রী হিসাবে বিধবাদের পছন্দ করতে পারতেন না? গবেষকরা ১৮৮৯ সালের *অমৃতবাজার* পত্রিকা উল্লেখ করে বলছেন বিধবাবিবাহের প্রচুর আবেদন জমা পড়ছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা সর্বাধিক। তাহলে কেবলমাত্র কুমারী পাত্রীর বিয়ের বাজারে দর রয়েছে, এ তত্ত্ব টেকে না। তাহলেও বিধবাবিবাহ নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠতে পারল না কেন?

গবেষকদের মতে তখনো বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়নি যেহেতু, তাই বিধবাদের অভিভাবকরা জানতে পারতেন না কে বিয়ের পর তাড়িয়ে দিয়ে আরেকটা বিয়ে করবে এবং কে একগামী হয়ে থাকবে, তা বলাও খুব কঠিন। এছাড়া স্বামীর দিক থেকে কোনো সম্পত্তি পেলে সেটা হাতছাড়া হওয়ার ভয়, সন্তান থাকলে সে নতুন স্বামীর কাছে কী আচরণ পাবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা বিধবাদের পুনর্বিবাহের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি আজকেও কার মনে কী আছে তার খবর পাওয়া কঠিন বলে মাত্র পাঁচজন বিধবার মধ্যে একজনের আবার বিয়ে হয়, বলছেন আরেক গবেষক জঁ ড্রেজ। নিচের সারণীটি খুব সীমাবদ্ধ তথ্য দিচ্ছে, দারিদ্র্যসীমার নিচের হিসেবে বিধবাদের অনুপাত আরও বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু এর থেকে অন্তত বোঝা যায় যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বিধবার থেকে বিপত্নীকরা অনুপাতে কম।

## বিধবার পুনর্বিবাহ: এখন

তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে না হলেও বিধবার পুনর্বিবাহ অনেক গোষ্ঠীতে চালু রয়েছে, মূলত উদ্দেশ্য হলো বিধবা মেয়েটির স্বামীর ভাগের জমির অংশ যাতে পরিবারের হাতের বাইরে চলে না যায়। জাঠদের মধ্যে বা অন্য গোষ্ঠীতেও বিধবা মেয়েটি চান বা নাই চান, স্বামীর আরেক ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ অনুমোদিত। এর বাইরে কাউকে বিয়ে করলে মেয়েটি জমি, খোরপোষ, এমনকি সন্তানের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবেন।

এখনও বিধবাদের পুনর্বিবাহের তথ্য খুব কম। সার্বিক সমীক্ষা বা তথ্য নেই, নমুনা সমীক্ষা কিছু হয়, কিন্তু তাতে সবই যে সত্যি উত্তর দেন, এটা ভাবার কারণ রয়েছে কি? তবে কারণগুলো এখনো একরকম রয়েছে বলেই মনে হয়। প্রথমত, ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে শাস্ত্র মেনে মনে করা হতো পুরুষের ক্ষেত্রে উপনয়ন রয়েছে, মেয়েদের জীবনে সেরকম কিছু নেই বলে বিবাহ হচ্ছে মেয়েদের জীবনে একমাত্র সংস্কার, তা একবারই ঘটতে পারে। তাই তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে মেয়েদের পুনর্বিবাহ চালু থাকলেও তা তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যে খুব কম হতো। বালবিধবা হলে মেয়েটির পুনর্বিবাহ হয়তো তার পিতৃপরিবারই ব্যবস্থা করত, কিন্তু পাত্রটি হবে বয়স্ক, নয়তো বিপত্নীক, অথবা অসুস্থ কিংবা প্রতিবন্ধকতা যুক্ত পুরুষ। দ্বিতীয়ত, পরিবারের তরফে আপত্তি না থাকলেও সন্তান থাকলে মেয়েরা একেবারেই পুনর্বিবাহের কথা ভাবেন না। অনেক সময়ই পুনর্বিবাহ করলে

মেয়েটিকে স্বামীর সম্পত্তি, এমনকি সন্তানকেও ছেড়ে চলে আসতে হয়, অনেক মেয়েই সেই মূল্য দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। তৃতীয়ত, পুনর্বিবাহ হলে, আইনে যেহেতু স্পষ্ট বলা হয়েছে স্বামীর সম্পত্তির অংশের উত্তরাধিকারী বলে তাঁকে আর গণ্য করা হবে না, তাই মেয়েরা অনেক সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। যদিও গত জুলাই ২০১৫ সালে মুম্বাই হাইকোর্ট একটি রায়ে স্পষ্ট বলেছে পুনর্বিবাহের ফলে কোনো হিন্দু বিধবা তাঁর প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না, কিন্তু সেই রায়ের প্রচার নেই। ওই রায়ে বলা হয়েছে যদিও হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন, ১৮৫৬-র ধারা ২ অনুযায়ী পুনর্বিবাহের ফলে বিধবা তাঁর প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাবেন না, কিন্তু ওই আইনের ধারা ৮ উত্তরাধিকারীদের শ্রেণীবিভাগ করছে। সেই অনুযায়ী স্ত্রী প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী, আত্মীয়রা দ্বিতীয় শ্রেণীর, তাই বিধবার সম্পত্তির স্বীকৃতি থাকছেই, পুনর্বিবাহের পরেও। আসলে এটা তো আইনের একটা ব্যাখ্যা, যা উদাহরণ হয়ে সমস্ত আদালতে সার্বিক স্বীকৃতি পাবে কিনা জানা নেই, নাকি তা আবার উচ্চতর আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। আদালতের রায় তো সবার পক্ষে বার করে

দারিদ্রসীমার নিচে বিধবা/ বিপত্নীক, ২০০১

| সাল | পুরুষ<br>শতকরা (সংখ্যা) | নারী<br>শতকরা (সংখ্যা) |
|---|---|---|
| ১৯০১ | ৫.৪ (৬৫২৩) | ১৮.০ (২১১২৫) |
| ১৯১১ | ৫.৪ (৬৯৩৩) | ১৭.৩ (২১৪০২) |
| ১৯২১ | ৬.৪ (৮২২৭) | ১৭.৫ (২৩৭২৬) |
| ১৯৩১ | ৫.৪ (৭৭১৮) | ১৫.৫ (২৩৯৭৭) |
| ১৯৪১ | ৫.৭ (৯৩৩০) | ১৫.১ (২৬৫০৯) |
| ১৯৫১ | ৫.১ (৯৪৬২) | ১২.৮ (২২৪৭১) |
| ১৯৬১ | ৩.৬ (৯২২৩) | ১০.৮ (২৪১১১) |
| ১৯৭১ | ৩.২ (৯০৪১) | ৯.২ (২৪৪৩৯) |
| ১৯৮১ | ২.৭ (৯১৪৩) | ৮.৫ (২৭২৭৯) |
| ১৯৯১ | ২.১ (৯১২৬) | ৬.৫ (২৭৬৩১) |
| ২০০১ | ১.৮ (১০৭১৭) | ৬.৯ (৩৬৬৩২) |

সূত্রঃ ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা সহায়তা প্রকল্প

আনা সম্ভব হয় না, তাই বিধবারা নির্ভর করেন শ্বশুরবাড়ির বিবেচনার উপরে। এখনও বেশিরভাগ গ্রামীণ পরিবারেই, যেখানে ভূসম্পত্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ, আইনের থেকে প্রচলিত আচার বা প্রথাই বেশি গুরুত্ব পায়। সেখানে সাধারণত পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে স্বামীর উত্তরাধিকারের অংশ থেকে বিধবারা ফসলের অংশ পাবেন আর পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলে শুধু খোরপোষ পাবেন, কারণ পুত্র বা পুত্রেরা পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে।

পুনর্বিবাহে উৎসাহ দেওয়ার সরকারি বা প্রশাসনিক উদ্যোগ কোথায়? শুধু তামিলনাড়ু সরকার বলেছে বিয়ে করলেও মেয়েরা প্রাক্তন স্বামীর সুবাদে চাকরি পেলে তা বজায় থাকবে। যেহেতু আমাদের পিতৃতান্ত্রিক ভাবনায় মেয়েকে সবসময় স্বামী ভরণপোষণ করবেন, তাই সেই মেয়ে পুনর্বিবাহ করলে তার বিধবা হিসাবে সব সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত হবে। সামাজিক ন্যায় এতে কতটা সাধিত হয় জানি না, কিন্তু পুনর্বিবাহ উৎসাহিত হয় না। একমাত্র মধ্যপ্রদেশ সরকারের সামাজিক ন্যায় বিভাগের তরফে একটি প্রকল্পে বলা হয় কেউ ১৮-৪৫ বছর বয়সসীমার মধ্যে কোনো বিধবাকে বিবাহ করলে দু'লক্ষ টাকা অনুদান পাবে। তবে শর্ত হলো পাত্রের ক্ষেত্রে এটি প্রথম বিয়ে হতে হবে এবং বিয়েটি অনুষ্ঠিত হবে জেলাশাসকের দপ্তরে, গ্রাম পঞ্চায়েত বা এইরকম কারুর কোনো শংসাপত্র গ্রাহ্য হবে না। এজন্য সরকার কুড়ি কোটি টাকার বরাদ্দ করেছে। কিন্তু কাউকে সে রাজ্যের বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এই প্রকল্প বাস্তবে কতটা কার্যকর বা গ্রহণযোগ্য হয়েছে—তা নিয়ে সংবাদপত্র নীরব।

হিন্দুদের তুলনায় অন্যান্য ধর্মীয়গোষ্ঠী, যেমন খ্রিস্টান বা মুসলিমদের মধ্যে পুনর্বিবাহ অনেক বেশি প্রচলিত বলে জনমনে ধারণা। কিন্তু তারও কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে খ্রিস্টান, বিশেষত কেরালার ক্যাথলিক গোষ্ঠীগুলো এ নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। কেরালা ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্সের পরিবারসংক্রান্ত কমিশন ঠিক করেছে যে তারা এবারে বিয়ের তথ্যের ওয়েবসাইটে বিশেষ করে চল্লিশের কমবয়সি বিধবাদের নাম নথিভুক্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেবে। তাদের হিসেবমতো কেরালাতেই প্রায় এক লক্ষ খ্রিস্টান বিধবা রয়েছে। এ বিষয়ে সাইরো-মালাবার, ল্যাটিন, সাইরো-মালংকারা সব গোষ্ঠীগুলিই সহমত হয়ে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে স্থির করে তাদের নিজ নিজ চার্চ এলাকায় উইডো ফোরাম তৈরি করে বিধবাদের সমস্যাগুলি বুঝতে উদ্যোগী হবে।

সবশেষে, হিন্দুদের মধ্যে কেন বিধবাবিবাহ আইন সত্ত্বেও যথেষ্ট প্রচার পায়নি, তার একটা কারণ হয়তো হতে পারে যে অক্ষতযোনি বিধবারাই শুধুমাত্র পুনর্বিবাহের যোগ্য, এই অবস্থান গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর, এবং পুনর্বিবাহের আরেক গুরুত্বপুর্ণ প্রবক্তা আর্য সমাজ। বিপরীতে পণ্ডিতা রমাবাই কিন্তু সব বিধবার পুনর্বিবাহের কথা বলছেন, হয়তো হিন্দুদের, বেশিরভাগ শাস্ত্রবিদের সমাজজীবনে অসততা এবং নারীবিরোধী বক্তব্য দেখে বিরক্ত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেই তিনি এই অবস্থান নিতে পেরেছিলেন। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী একদিকে যেমন নিয়োগ প্রথায় বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ বিধবারা সমাজের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারবে, তেমনি একই সঙ্গে অক্ষতযোনি বিধবার পুনর্বিবাহের জন্য বহু উদ্যোগ নিয়েছেন। আর্যসমাজের তরফে একই সঙ্গে *বিধবা বন্ধু*, *বিধবা সহায়ক* আর *উইডো কজ* বলে তিনটি পত্রিকা যথাক্রমে হিন্দি, উর্দু আর ইংরেজিতে বেরোত। অবিভক্ত ভারতের লাহোর, অমৃতসর থেকে হরিদ্বার, মথুরা, বিভিন্ন জায়গায় আর্যসমাজপন্থীরা বিধবা আশ্রম করেছেন, বিধবাবিবাহের উদ্যোগ নিয়েছেন, অনেকে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে জাতিচ্যুত হয়েছেন (*উইমেন্স ইস্যুস অ্যান্ড আর্যসমাজ*, ইন্দু বালা, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ, জুলাই, ২০১৪)। কিন্তু হিন্দু মানসে অক্ষতযোনি বিধবার আকাঙ্ক্ষা আরও গভীরে চেপে বসেছে। তাই আজও নারীবাদী আলোচনায় সব বিধবার পুনর্বিবাহ, স্বনির্ভরতার দাবি খুব বেশি ওঠে না। তবে আশ্বাসের কথা যে বিধবা, স্বামীপরিত্যক্ত, বিবাহবিচ্ছিন্না থেকে শুরু করে অবিবাহিতা মেয়ে, যাঁদের ভরণপোষণ দেওয়ার মতো কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই এরকম একলা মেয়েরা নিজেরাই জোট বাঁধছেন বিভিন্ন জায়গায়।

আজ হিন্দুদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত। তবুও সমাজভয় যাঁরা পেরোতে পারছেন, অনেকেই এখনো হয়তো সম্ভাব্য পাত্র সম্বন্ধে তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছেন। প্রযুক্তি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিধবাদের জন্য বিয়ের পাত্র খোঁজার ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে, তবে একনজরে মনে হলো বিপত্নীকদের সংখ্যা, প্রত্যাশিত ভাবেই সেখানে বেশি। তাই বিদ্যাসাগরের জন্য আমরা যারা পড়াশুনো শিখে নিজের জীবন নিজেরা বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি, আমাদের কাজ আজও ফুরোয়নি। কেন আজও পরিবার আর সমাজ থেকে

বিধবাদের নিঃশব্দে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলে? কেন তাঁরাই বা সমাজ থেকে নিজেদের এমনভাবে মুছে দেওয়ার চেষ্টায় সতত ব্যস্ত থাকেন? আমরা সবাই, বিশেষত মেয়েরা এগিয়ে এসে বিধবাদের প্রতি যে-কোনো বৈষম্য দেখলে যেদিন দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারব বৈধব্য জীবনচক্রেরই একটা অংশ, যা যে-কোনো বিবাহিতা মেয়ের জীবনে যে-কোনো দিন আসতে পারে, তার সঙ্গে ভাগ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেদিন আমরা বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করতে পারব।

---

সিটি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট সমাজকর্মী, গবেষক, প্রাবন্ধিক।